তারিখ 07 MAR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

দৈনিক সংবাদ

# শিক্ষক ও শিক্ষকতা

অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক

তাঁকেই আমরা শিক্ষক বলি যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা করে থাকেন। তিনি নিজে শিখবেন, ছাত্রদের শেখাবেন ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন করবেন। তাঁর প্রধান কাজ হলো মানুষের মধ্যে নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা, তাকে সুশৃংখল করা ও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করা। জগতের শিক্ষাগুরু মহর্ষি সক্রেটিস মানবদেহধারী দ্বিপদ প্রাণীগুলোকে মানুষ করেছেন তাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ সাধন করে। প্রাচীন যুগে একজন জ্ঞানীগুণী শিক্ষকের নাম যখন ছড়িয়ে পড়তো তখন চারদিক থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতো তার পাদপদ্মে বসে জ্ঞান আহরণের জন্য। যেমন সক্রেটিস এবং প্লেটোর নিকট ছুটে এসেছিল বহু শিক্ষার্থী। প্রাচীন ভারতেও এর বহু উদাহরণ রয়েছে। তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতেও।

তখন ব্যক্তিবিশেষকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতো এক 'একটা কেন্দ্র। ছাত্ররা গুরুগৃহে অবস্থান, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলাফেরা, লেখাপড়া সবই করতো। বিদ্যা শিক্ষার সাথে সাথে গুরুর চারিত্রিক গুণাবলী, দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেতো ছাত্ররা অতি নিকট থেকে। গুরুও ছাত্রদের সবকিছু দেখতেন। তাদের মেধা, আচার-ব্যবহার, দোষগুণ সবই তার নখদর্পণে থাকতো। তাই শিক্ষা-উপদেশ এবং আদেশ দেয়া সহজ হত। ছাত্রদের কাছ থেকেও গুরু অনেক জানতে পারতেন। এতে করে আদান-প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা শুরু হতো।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। এতে বেশ কিছু সংখ্যক গুরু-শিষ্য এক সাথে থেকে লেখাপড়ার চর্চা করতো। এমনি করেই গড়ে উঠেছিল নালন্দা, কর্ডোভা-গ্রানাডা ও ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা ধরনের বিদ্যালয়। এগুলোতে ধর্ম ও নীতিকথাই শেখানো হত বেশী করে। তবে এর সাথে সমসাময়িক জ্ঞান শিক্ষা ও নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনেও ব্রতী ছিলেন অনেকেই। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হতো ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে বা সামাজিক উদ্যোগে। সরকারের বড় একটা অবদান এগুলোতে ছিল না। বরং মাঝে মাঝে বৈরীভাবই প্রকট হয়ে পড়তো। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষিত লোকদের ধ্যান-ধারণা এক হতো না বরং বিপরীতমুখী হত। তাই সরকার এগুলোর উপর খড়গহস্ত হত এবং অনেক সময় বন্ধ করে দিত। এমনকি স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিত। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কারণেই বড় একটা সরকারের অর্থানুকূল্যের মুখাপেক্ষী হতো না। অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই এগুলো গড়ে উঠেছিল।

পরে অবশ্যই সরকার যখন বুঝল কেবল ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করা বা সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষার দরকার তা নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায়ও শিক্ষা এবং শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন আছে, তখন সরকারও কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে লাগল এবং চালু বিদ্যালয়গুলোরও কোন কোনটাতে অর্থ সাহায্য দিতে লাগল। সরকার প্রয়োজনমত নিজস্ব শিক্ষা নীতিও প্রবর্তন করতে লাগল। বিদ্যার্থীদের চাকরি-বাকরি পাওয়ার খাতিরে অনেক বেসরকারী বিদ্যলয়ও এসব নীতি মেনে নিতে লাগল। এভাবে সরকার এবং বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হলো। প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে লাগল। প্রচলিত বিদ্যা আয়ত্ত করার সাথে সাথে যারা নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাবার কাজে ব্রত তাদের পক্ষে সরকারের নির্ধারিত ধারায় চলা সম্ভব হতো না। তারা নিজেদের পাঠক্রম ও গবেষণার বিষয়বস্তু নিজেরাই ঠিক করতে লাগলো। এক কথায় তারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জ্ঞানের বর্তিকা হাতে অগ্রসর হতে লাগলো। অবশ্য বর্তমানে অনেক দেশেই সরাসরি সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী লেখাপড়া পরিচালনা করে। আবার কোন কোন দেশে সরকারের নির্ধারিত পদ্ধতির বাইরে যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে এদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাই এটাই স্বীকৃত সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত হওয়াই উচিত। অন্তত আমাদের দেশে আমরা এ ধারণারই বশবর্তী ও প্রবক্তা।

## শিক্ষকের যোগ্যতা

এখন কথা হলো শিক্ষক কারা হন এবং কি বা তাদের বৈশিষ্ট্য। পূর্বেই বলেছি, আগে যারা শিক্ষক হতেন তাঁদের অগাধ জ্ঞান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কাকেও আলাদা করে কিছু বলতে হতো না। এমনিতেই বিদ্যার্থীরা তাঁর কাছে ভিড় জমাত। এ অবস্থা অনেক দিন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক যুগের কথাই ধরেন। এস, এন, বোস, জ্ঞান ঘোষ, শহীদুল্লাহ প্রভৃতির কথাই ধরুন। তাঁদের মত শিক্ষক পাওয়া যে-কোন ছাত্রের পক্ষেই সৌভাগ্যের কথা ছিল। কিন্তু ক্রমশ শিক্ষকতা যখন আর দু' চারটা চাকরির মত পেশা হয়ে দাঁড়াল তখন তার আর পূর্বের মত গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান রইল না। মাঝারি ধরনের মেধাবিশিষ্ট লোকের সংখ্যাধিক্য দেখা দিল। তাই জর্জ বার্নার্ডশ ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন, 'He who can does; he who can not teaches' বর্তমান শতাব্দীর ষাট দশকের গোড়ার দিকে সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের পরিচালক বলেছিলেন, 'The theaching profession is personated with individuals who from youth upwards reveal the following characteristics: average drive for power, average ambition and escapism.'

এ ধরনের বহু কথা আছে শিক্ষক সমাজ সম্বন্ধে। মেধাবী ছাত্রদের এ পেশায় আকৃষ্ট না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল অন্যান্য পেশার তুলনায় এর বেতনক্রমের ন্যূনতা, সামাজিক স্বীকৃতির অভাব। আমাদের দেশেও শিক্ষকদের কথা উঠলে বলা হতো গরীব মাষ্টার। তাই আগে একজন ম্যাট্রিক পাস লোক অফিসে সামান্য পিয়নের চাকরি পেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাইত না। আবার একজন সিএসপি হতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বাদ দিতেন। এখনও পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যারা উচ্চস্তরের চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় তাদের পছন্দের তালিকায় শিক্ষকতা সর্ব নিম্নে থাকে। এহেন অবস্থায় যাঁরা শিক্ষক হন তাঁদের উপযুক্ততা

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 MAR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

প্রশ্নাতীত নয়। আবার ভাবতেও কষ্ট হয় কি করে একজন তৃতীয় শ্রেণীতে এসএসসি এবং এইচ এসসি পাওয়া লোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দান করতে পারেন। তাঁর শিক্ষকতা ও নির্দেশনা সবই ত তৃতীয় মানের হতে বাধ্য। কাজেই শিশুদের ভবিষ্যত ঝরঝরে। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও যে কিছু কিছু নিম্নমানের শিক্ষক আছেন তা অস্বীকার করা যায় না।

এ সব খারাপ কথা বলার পরও বলতে হয় অবস্থা যতটা খারাপ মনে হয় ততটা খারাপ নয়। এখন একদিকে বেতনক্রমও কিছুটা ভালর দিকে গেছে, অন্যদিকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতার দিকে অধিক সংখ্যায় আসছে। আশা করি আমাদের এপ্রিয় পেশাটিকে পূর্বের ন্যায় গৌরবের আসনে উন্নীত করতে তাঁরা সচেষ্ট হবেন। আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী। তবে শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষাগত মানের দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে নির্বাচন প্রার্থীর চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে। শিক্ষকের চলনভঙ্গি, বাচনভঙ্গি সবই শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করে থাকে। কাজেই একজন শিক্ষককে আদর্শস্থানীয় হতে হয়। একজন মিথ্যাবাদী, অহংকারী ও অসহিষ্ণু লোক যতই বিদ্বান হন না কেন, শিক্ষক হিসেবে তার নিয়োগ উচিত হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। নিয়োগবিধিতে এর উল্লেখ ও পালনের নির্দেশ থাকা উচিত।

## শিক্ষকের কর্তব্য ও ভূমিকা

এখন আমি শিক্ষকদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। শিক্ষকদের কাজ হলো তাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল শিক্ষার্থী বিদ্যা শিখতে আসবে তাদেরকে বিদ্যাদান করা এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে বিদ্যার্থীর মনে অধীত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে এবং উৎসাহ জাগে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আসলে প্রাথমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষকগণ একটা জটিল ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা কতকটা (১) বিদ্যালয়ের পরিবেশে, আর কতকটা (২) সামাজিক পরিবেশে কাজ করেন।

(১) বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্তব্য ও ভূমিকা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(ক) বিদ্যা এবং বিদ্যার্থীর মধ্যে মধ্যস্থতা করা,

(খ) শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের সহায়ক হওয়া,

(গ) সাময়িকভাবে পিতামাতার স্থান দখল করা,

(ঘ) শিক্ষার্থীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া,

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতার মান নির্ণয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করা,

(চ) পাঠক্রম নির্ধারণ করা,

(ছ) অধীত বিষয়ে সুপণ্ডিত ও নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনে সুগবেষক হওয়া,

(জ) প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা,

(ঝ) পেশাগত সংস্থা ও শিক্ষক সমিতির সদস্য হওয়া এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

(২) সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা:

(ক) জনহিতকর ক্রিয়াকর্ম করা,

খ) মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নীতিবোধের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করা,

(গ) কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রের জ্ঞান বা নৈপুণ্যের অধিকারী হিসেবে কাজে আসা,

(ঘ) সমাজে নেতৃত্বদান করা,

(ঙ) সামাজিক বিবর্তনে প্রতিনিধিত্ব করা।

উপরে যে সকল ক্রিয়াকর্ম ও ভূমিকার কথা বলা হলো তা মোটামুটিভাবে আপনাদের জানা, কাজেই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলছি।

শিক্ষককে বিদ্যা ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার কথা বলতে আমরা শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে আগে বলেছি তারই পুনরুল্লেখ করতে হয়। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে শিক্ষক কেবলমাত্র আপন মতামত এবং পাঠ্যপুস্তকে যা লেখা আছে তাই ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। নিজের কথা যেমন বুঝিয়ে বলবেন তেমনি ছাত্রদেরকেও আপন মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে হবে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা মুখস্থ করার উপরই জোর দেই বেশী, শিক্ষার্থীরা কতটা উপলব্ধি করে জিনিসটা আত্মস্থ করেছে সেটা দেখি না। এতে ছাত্ররা হয় তোতাপাখী না হয় ভারবাহী পশু। এ বিদ্যা তাদের কোন কাজে আসে না। জলজ্যান্ত উদাহরণ দেয়া এবং হাতে-কলমে শেখানটা মনে দাগ কাটে অনেক বেশী, বিশেষ করে কচি ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগে আমার ম্যানিলা শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠদানরত একজন শিক্ষিকার ক্লাস নেয়ার পদ্ধতি দেখার সুযোগ হয়েছিল। এটা ছিল জীববিজ্ঞানের ক্লাস। ক্লাসে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। এদেরকে পূর্বেই বলা হয়েছিল কিছু প্রাণীর নমুনা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। দেখলাম কেউ একরকম বিশেষ ধরনের মাছ, কেউ ইঁদুর, কেউ প্রজাপতি এমন কি কেউ বিড়াল নিয়ে এসেছিল। যে যে প্রাণী এনেছিল তাকে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। শিশুরা যে যেখানে ঠেকে যেতো শিক্ষক তখনই খানিকটা আভাস দিতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে ফেলতো। এমনকি শিশুরা কোন কোন প্রাণীর দেহচ্ছেদ করে নাড়ীভূঁড়ি চিহ্নিত করেছিল। বর্ণনা করেছিল বিভিন্ন প্রাণীর বিশেষ ধরনের আত্মরক্ষার পদ্ধতি। ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের এত সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন তা দেখে সত্যই অভিভূত হয়েছিলাম। ছেলে-মেয়েদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে মনে হয়েছিল আমি যদি এই ভদ্র মহিলার মত একজন সফলকাম শিক্ষক হতে পারতাম। তাই বলি আমরা যারা মানুষ গড়ার কারিগর তারা যেন সত্যিই মানুষ গড়ি, সুন্দর তোতাপাখী না বানাই। একথা মনে রেখে শিক্ষকরা যদি অগ্রসর হন তবে প্রথম ধারার (ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত সবগুলো উপধারাই স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে। নতুন কিছু বলার থাকবে না।

## পাঠক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুকেই পড়া, লেখা ও অংক শেখাতে হয়। তার সাথে পরিবেশ পরিচিতি ও সাধারণ নীতি কথা শেখান উচিত। এরপর কিছু কিছু আদর্শ শেখাতে হয় যা রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় মূল নীতি বা উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো রাষ্ট্রই ঠিক করে দেয়। কিন্তু উপরের স্তরের বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানেরই ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। তা হলেই মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ বাড়বে। তবে যাদেরকে এ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হবে তাদের উচিত হবে দেশ ও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দেশের ও জাতির কল্যাণে আসতে পারে সে সকল বিদ্যায় প্রাধান্য দেয়া। বিশেষ করে সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পাঠক্রমে নির্ধারণ করার সময় একথা মনে রাখবেন বলেই সমাজ আশা করে।

(বাকী অংশ আগামীকাল)